উপন্যাস

হাজাম বাড়ির কর্তার নাম সংসার আলী। এমন বুড়ার বুড়া হয়েছে, হাঁটাচলা করতে পারে না। যেখানে বসে থাকে, বসেই থাকে। আমার মুখের সামনে স্পিকার ধরল। আমি গান দিলাম। গান শুনে স্পোর্টসে আসা সব লোকের তাক লেগে গেল। তারপর দেখি একটা করে খেলা শেষ হয় আর আমাকে একটা করে গান দিতে বলে। যত গান জানতাম সব সেদিন গেয়ে ফেললাম। হাজাম বাড়ির কর্তার নাম সংসার আলী। এমন বুড়ার বুড়া হয়েছে, হাঁটাচলা করতে পারে না। যেখানে বসে থাকে, বসেই থাকে। আমার মুখের সামনে স্পিকার ধরল। আমি গান দিলাম। গান শুনে স্পোর্টসে আসা সব লোকের তাক লেগে গেল। তারপর দেখি একটা করে খেলা শেষ হয় আর আমাকে একটা করে গান দিতে বলে। যত গান জানতাম সব সেদিন গেয়ে ফেললাম। হাজাম বাড়ির কর্তার নাম সংসার আলী। এমন বুড়ার বুড়া হয়েছে, হাঁটাচলা করতে পারে না। যেখানে বসে থাকে, বসেই থাকে। আমার মুখের সামনে স্পিকার ধরল। আমি গান দিলাম। গান শুনে স্পোর্টসে আসা সব লোকের তাক লেগে গেল। তারপর দেখি একটা করে খেলা শেষ হয় আর আমাকে একটা করে গান দিতে বলে। যত গান জানতাম সব সেদিন গেয়ে ফেললাম। হাজাম বাড়ির কর্তার নাম সংসার আলী। এমন বুড়ার বুড়া হয়েছে, হাঁটাচলা করতে পারে না। যেখানে বসে থাকে, বসেই থাকে। আমার মুখের সামনে স্পিকার ধরল। আমি গান দিলাম। গান শুনে স্পোর্টসে আসা সব লোকের তাক লেগে গেল। তারপর দেখি একটা করে খেলা শেষ হয় আর আমাকে একটা করে গান দিতে বলে। যত গান জানতাম সব সেদিন গেয়ে ফেললাম। হাজাম বাড়ির কর্তার নাম সংসার আলী। এমন বুড়ার বুড়া হয়েছে, হাঁটাচলা করতে পারে না। যেখানে বসে থাকে, বসেই থাকে। আমার মুখের সামনে স্পিকার ধরল। আমি গান দিলাম। গান শুনে স্পোর্টসে আসা সব লোকের তাক লেগে গেল। তারপর দেখি একটা করে খেলা শেষ হয় আর আমাকে একটা করে গান দিতে বলে। যত গান জানতাম সব সেদিন গেয়ে ফেললাম। হাজাম বাড়ির কর্তার নাম সংসার আলী। এমন বুড়ার বুড়া হয়েছে, হাঁটাচলা করতে পারে না। যেখানে বসে থাকে, বসেই থাকে। আমার মুখের সামনে স্পিকার ধরল। আমি গান দিলাম। গান শুনে স্পোর্টসে আসা সব লোকের তাক লেগে গেল। তারপর দেখি একটা করে খেলা শেষ হয় আর আমাকে একটা করে গান দিতে বলে। যত গান জানতাম সব সেদিন গেয়ে ফেললাম। হাজাম বাড়ির কর্তার নাম সংসার আলী। এমন বুড়ার বুড়া হয়েছে, হাঁটাচলা করতে পারে না। যেখানে বসে থাকে, বসেই থাকে। আমার মুখের সামনে স্পিকার ধরল। আমি গান দিলাম। গান শুনে স্পোর্টসে আসা সব লোকের তাক লেগে গেল। তারপর দেখি একটা করে খেলা শেষ হয় আর আমাকে একটা করে গান দিতে বলে। যত গান জানতাম সব সেদিন গেয়ে ফেললাম। হাজাম বাড়ির কর্তার নাম সংসার আলী। এমন বুড়ার বুড়া হয়েছে, হাঁটাচলা করতে পারে না। যেখানে বসে থাকে, বসেই থাকে। আমার মুখের সামনে স্পিকার ধরল। আমি গান দিলাম। গান শুনে স্পোর্টসে আসা সব লোকের তাক লেগে গেল। তারপর দেখি একটা করে খেলা শেষ হয় আর আমাকে একটা করে গান দিতে বলে। যত গান জানতাম সব সেদিন গেয়ে ফেললাম। হাজাম বাড়ির কর্তার নাম সংসার আলী। এমন বুড়ার বুড়া হয়েছে, হাঁটাচলা করতে পারে না। যেখানে বসে থাকে, বসেই থাকে। আমার মুখের সামনে স্পিকার ধরল। আমি গান দিলাম। গান শুনে স্পোর্টসে আসা সব লোকের তাক লেগে গেল। তারপর দেখি একটা করে খেলা শেষ হয় আর আমাকে একটা করে গান দিতে বলে। যত গান জানতাম সব সেদিন গেয়ে ফেললাম। হাজাম বাড়ির কর্তার নাম সংসার আলী। এমন বুড়ার বুড়া হয়েছে, হাঁটাচলা করতে পারে না। যেখানে বসে থাকে, বসেই থাকে। আমার মুখের সামনে স্পিকার ধরল। আমি গান দিলাম। গান শুনে স্পোর্টসে আসা সব লোকের তাক লেগে গেল।

হিজল ফুলের দিন

ইমদাদুল হক মিলন

মিলুকর্তা।

কোনও কোনওদিন মনের খুব ভিতর থেকে ডাকটা শুনতে পাই।

কে ডাকে এই নামে?

মিলুকর্তা নামটা দিয়েছিল আজিজ। আমিনুল মামাদের বাড়ির উত্তর দিককার ভাঙনের দিকে হতদরিদ্র একটা কুঁড়েঘর। সেই ঘরে থাকে পাইন্নার মা। পাইন্নার মার ছোটছেলে আজিজ। পাইন্না মারা গেছে কবে কে জানে। তবু তার নামেই পাইন্নার মা।

বিক্রমপুর অঞ্চলে ভাইশ্রেণীর বড়দেরকে দাদা ডাকার নিয়ম। আমরাও ডাকতাম। তবে শুদ্ধ নামে না। আজিজকে ডাকতাম আইজ্জাদা। কালো মতন সতেরো আঠারো বছরের যুবক। চঞ্চল স্বভাবের। এই এদিকে যাচ্ছে, এই ওদিকে যাচ্ছে। চঞ্চলতার সীমা পরিসীমা নাই।

আমাকে খুব আদর করতো।

আমি ছিলাম আইজ্জাদার খুব বাধুক। হাজাম বাড়ির মেজো ছেলেটির নামও আজিজ। দুই আজিজে খুব দুস্তি ছিল। একবার কোত্থেকে প্রচণ্ড গাঁজা খেয়ে এলো আইজ্জাদা। এসে অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ল হাজাম বাড়ির উঠানে। হাজাম বাড়ির বড়ছেলের নাম আবদুল। আবদুলের মা তেঁতুল গুলিয়ে বদনার নল দিয়ে আইজ্জাদার মুখে ঢুকাচ্ছিল। খবর পেয়ে আমরা দৌড়ে গেছি। আইজ্জাদা চিত হয়ে শুয়ে আছে উঠানের সাদা মাটিতে। আবদুলদার মা বদনার নল দিয়ে তেঁতুলগোলা পানি খাওয়াচ্ছে। গলায় যতটা না যাচ্ছে পানি তারচে' অনেক বেশি গড়িয়ে পড়ছে উঠানে। চৈত্র মাসের হাওয়ায় ভাসছে টকটক গন্ধ।

হাজাম বাড়ির কর্তার নাম সংসার আলী। এমন বুড়ার বুড়া হয়েছে, হাঁটাচলা করতে পারে না। যেখানে বসে থাকে, বসেই থাকে। লুঙ্গিটা সবসময় কাছা মারা। হঠাৎ করে তাকালে মানুষ মনে হয় না। মনে হয় মরে শুকিয়ে যাওয়া একটা ঝোঁপ। তামাক ছিল তার প্রধান খাদ্য। জীবনে যতবার তাকে দেখেছি, নারকেলের হুকাটা হাতে আছেই। তার এক মেয়ের নাম তছি। জন্মপাগল মেয়ে। সে কোথায় ছিল সেদিন কে জানে। কোত্থেকে ছুটে এলো। আইজ্জাদার ওই অবস্থা দেখে বলল, হায় হায় মইরা গেছেনি?

শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদি আর নাক টানি। পরনে ইংলিশ প্যান্ট, স্যান্ডো গেঞ্জি। গেঞ্জি তুলে চোখ মুছি। সংসার আলী তামাক টানতে টানতে ঘ্যার ঘ্যারা গলায় বলল, কাইন্দো না। মরে নাই। ঘণ্টাখানি পর জেতা হইয়া যাইব।

বিকালবেলা সত্যি সত্যি আইজ্জাদাকে দেখি হাজাম বাড়ির আজিজের সঙ্গে গলাগলি করে জাহিদ খাঁর বাড়ির হালটের দিকে যাচ্ছে। হালটের পুবপাশে সবুজ ঘাসে ভরা একখানা ভিটা। ভিটায় বহুকালের পুরনো একটা হিজল গাছ। সেই গাছের তলায় গিয়ে বসে দুই দোস্তে এখন গল্প করবে।

আমার নানাদের পদবি ছিল 'মেন্দা'।

এই পদবি হওয়ার পিছনে একটা কাহিনী আছে। নানাদের পূর্ব পুরুষ কেউ জমিদার বাড়িতে বিচার দিতে গেছে। বিক্রমপুর তখন পরগনা, হিন্দু জমিদারদের এলাকা। বিচার দিয়ে আসার পর একদিন বিচার ডাকা হয়েছে, সালিশ বসেছে। যার বিরুদ্ধে বিচার দেয়া হয়েছে সেই লোকও আছে। কিন্তু যিনি বিচার দিয়েছেন তিনি আর ঠিক মতো কথা বলতে পারছিলেন না। জমিদার জিজ্ঞেস করেছেন, কী কইতে চাস ক? অভিযোগটা কী?

তিনি আর কথা বলতে পারেন না। শুধু মিনমিন করেন। কী বলতে চাইছেন, সালিশে বসা লোকজন কেউ তা শুনতেও পায় না, বুঝতেও পারে না।

জমিদার বাবু আবার বললেন, যা কইতে চাস পরিষ্কার কইরা ক। তোর অভিযোগ কী?

সেই লোক তখনও মিনমিন করে। জমিদার গেলেন রেগে। এই, এইটা এমুন মেন্দা মাইরা রইছে ক্যা? মেন্দার বিচার আমি করুম না। মেন্দাটারে খেদা।

ওই যে জমিদার মেন্দা বললেন, সেই থেকে এলাকার লোকে তাদের নামের সঙ্গে মেন্দা যোগ করে দিল। অমুক মেন্দা, তমুক মেন্দা।

আমার নানারা ছিল মেন্দাদের তৃতীয় প্রজন্ম।

মেদিনী মণ্ডল বিশাল গ্রাম। বিশালত্বের জন্য দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে গ্রাম। উত্তর মেদিনী মণ্ডল, দক্ষিণ মেদিনী মণ্ডল। এই বিশাল গ্রামে তিনটা মাত্র মেন্দাবাড়ি। খানবাড়ির পশ্চিমে যে বাড়ি সেটা বড় মেন্দাবাড়ি। ওই বাড়ির পিছন থেকে শুরু হয়েছে বিল। উত্তরে বিল, দক্ষিণেও বিল। শুধু পুবদিকে ঘরবাড়ি।

বড় মেন্দাবাড়ির রাজ্জাক মাস্টার সম্পর্কে আমার নানা। মার দূর সম্পর্কের চাচা। টকটকে গায়ের রং, সুদর্শন মিষ্টভাষি মানুষ। প্রত্যেকের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেন। আমাকে দেখলেই বলতেন, কী খবর নানাভাই? আছ কেমুন?

আর ছিল সোনামিয়া। তিনিও নানা। গ্রামের সবচাইতে লম্বা লোক। টিংটিংয়ে, রোদে পোড়া চেহারা।

বড় মেন্দাবাড়ির আর কারও সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা ছিল না।

দ্বিতীয় বাড়িটিকে বলা হতো পুরান বাড়ি। ওই বাড়ির নানাটির নাম নোয়াব আলী। খান বাড়িতে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছারি ছিল। সিরাজ খান সাহেব চেয়ারম্যান। লোকে বলতো সেরু খাঁ। তাঁর একটা ঘোড়া ছিল। বিচার সালিশে যেতেন ঘোড়ায় চড়ে, হাটবাজারে যেতেন ঘোড়ায় চড়ে।

ধু ধু মনে আছে, মাত্র একবার তাঁকে আমি সামনা সামনি দেখেছিলাম। নানা বাড়িতে বিচার করতে এসেছিলেন। ঘোড়ায় চড়ে তিনি আসছেন। আমরা বারবাড়িতে দাঁড়িয়ে তাঁর পথের দিকে তাকিয়ে আছি। ধপধপে পাজামা পাঞ্জাবি পরা, দেবদূতের মতো একজন মানুষ ঘোড়ায় চড়ে আমাদের বাড়ির দিকে আসছেন। বাড়ির মানুষদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা। বউঝিরা আড়ালে আবডালে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছে। বাড়ির উঠানে হাতলঅলা ভারি একটা চেয়ার পাতা। তিনি এসে সেই চেয়ারে বসলেন। তাঁর আলোয় বাড়িটা মনে হলো আলোকিত হয়ে গেছে।

নোয়াব আলী নানা ছিলেন তাঁর সঙ্গে। লেখাপড়া জানা লোক। পঞ্চায়েতের খাতাপত্র লেখার কাজ করতেন। এজন্য লোকে তাঁকে বলতো 'নোয়াব আলী পঞ্চাইত।' অতি অমায়িক ধরনের ভাল মানুষ। প্রত্যেকের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন। খরালিকালে খান বাড়ির দিককার হালট ধরে ছাতা মাথায় তিনি হেঁটে যাচ্ছেন, এই দৃশ্য এখনও আমার চোখে লেগে আছে।

একবার কালীরখিলের মাঠে বিরাট স্পোর্টস। মাইকে গান গাইলাম আমি। তার আগে চন্দ্রের বাড়ির মাঠেও স্পোর্টসে কয়েকটা গান গেয়েছিলাম। তখন বিয়েবাড়ি কিংবা গ্রামের উৎসব আনন্দে মাইক ভাড়া করে আনা হতো। সন্ধ্যা হেমন্ত শ্যামল মিত্র এইসব শিল্পীর রেকর্ড বাজানো হতো। পাথর কাটা ভারি ভারি রেকর্ড। গ্রামফোনে রেকর্ড বসিয়ে পুরনো দিনে বাসট্রাক স্টার্ট দেয়ার জন্য 'দ'য়ের মতো যে লোহার দণ্ড ব্যবহার করা হতো অমন ছোট সাইজের একটা জিনিস দিয়ে পাম্প করতে হতো। রেকর্ডের লেবেলে হিজ মাস্টার্স ভয়েসের কুকুরটা বসে থাকতো।

মাইক ভাড়া আনতে হতো গোয়ালিমান্দ্রা হাট থেকে, কোনাপড়া শ্রীনগর কিংবা দিঘলী বাজার থেকে। হলদিয়া বাজারেও বোধহয় ভাড়ার মাইক পাওয়া যেত। কোনও গভীর বর্ষার রাতে কিংবা শীতের রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে শুনতাম বহুদূর থেকে হাওয়ায় ভেসে আসছে, 'আমার স্বপ্ন দেখা রাজকন্যা থাকে'। হাওয়ার টানে একবার কাছে আসে গান, একবার দূরে চলে যায়।

গনি মামা গান গাইতেন। আর গাইতেন ফজল কাকা।

ফজল কাকা একবার তার দোস্ত নিয়ে বেড়াতে এসেছে। বিকালবেলা পুনুআম্মার সঙ্গে বাগানে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। এক সময় শুনি গলা ছেড়ে গান গাইছেন। 'ছেলেবেলার গল্প শোনার দিনগুলি'। এই গানটা আমার যে কী প্রিয় ছিল! কাকাকে বললাম, গানটা আমারে লেইখা দেন কাকা।

ফজল কাকা লিখে দিয়েছিলেন। কী সুন্দর হাতের লেখা ছিল ফজল কাকার।

গনি মামা থাকতেন খুলনায়। বোধহয় সেখানে কলেজে পড়তেন। একবার খবর এলো তার টাইফয়েড হয়েছে। তখনকার দিনে টাইফয়েড ভয়ঙ্কর রোগ। আমার বড়ভাই আজাদেরও হয়েছিল। ছোটবেলায় আজাদ কোনও ক্ষ্যাপাটে আচরণ করলে বুজি বলতো, ছোডকালে টাইফুট হইছিল তো, এর লেইগা অর মাথায় একটু ছিট আছে।

আমরা নানীকে বলতাম বুজি।

তো গনি মামার টাইফয়েডের খবর পেয়ে ছোট নানার ফ্যামিলিতে কান্নাকাটি লেগে গেল। নানা তখন কলকাতা না গোয়ালন্দ মনে নাই। তিনি ছিলেন জাহাজের কেরানি। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনিই ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিলেন। এজন্য

কেরানির চাকরি পেয়েছিলেন জাহাজে। লোকে তাঁর নামের সঙ্গে কেরানি যোগ করেছিল। নাম ছিল ইন্তাজউদ্দিন, লোকে বলতো 'ইন্তাজদ্দি কেরানি'।

আমার নানা ছিলেন বড়। সালতাবউদ্দিন। তিনি ছিলেন সারেঙ। মেজোনানার নাম আলতাবউদ্দিন, তিনি সারেঙ। সালতাবদ্দি সারেঙ, আলতাবদ্দি সারেঙ। নামের শেষের 'ন' অক্ষরটির উচ্চারণ কেউ করতো না।

হামিদ মামা তখন কাজির পাগলা স্কুলে পড়েন। এইট নাইন হবে। বড় ভাইয়ের টাইফয়েড হয়েছে। বিদেশ বিভুঁইয়ে পড়ে আছে। কী না কী হয়। তিনি রওনা দিলেন ভাইয়ের কাছে। টিনের ফুল পাখি লতাপাতা আঁকা একখানা সুটকেস, সঙ্গে চিকন রশি দিয়ে বাঁধা কাথায় প্যাচানো একটা বালিশ। আমার পরিষ্কার মনে আছে, এলুমিনিয়ামের একটা বদনাও বাঁধা ছিল কাথা বালিশের সঙ্গে।

দিনটির কথা মনে হলে এলুমিনিয়ামের সাদা বদনাটাই আমার চোখে প্রথম ভেসে ওঠে। টাইফয়েড আক্রান্ত ভাইয়ের মাথায় স্বচ্ছন্দে পানি দেয়ার জন্য একটা বদনাও সঙ্গে করে নিচ্ছে আরেক ভাই।

বাড়িতে থাকলে সারাক্ষণ গুনগুন করে গান গাইতেন গনি মামা। তখনকার দিনের সব আধুনিক গান। উত্তম সুচিত্রার সিনেমার গান। এত মিষ্টি গলা মামার! আমি মুগ্ধ হয়ে তাঁর পিছন পিছন ঘুরি। তার মুখে শোনা গান গোপনে মুখস্ত করে ফেলি।

এক দুপুরে বাগানের দিক থেকে গনি মামার গান শুনতে পাই কিন্তু তাঁকে আর চোখে দেখি না। এদিক খুঁজি ওদিক খুঁজি কিন্তু গনি মামা নাই। তার গান আছে।

মামাকে খুঁজতে খুঁজতে আমি বাগানের একেবারে দক্ষিণ দিকে চলে গেছি। সেখানে ঝোপঝাড়ের ফাঁকে, ভাঙনের দিকে পায়খানা ঘর। মাথার ওপর এবং চারদিকে ঢেউটিনের বেড়া, সামনের দিকে টিনের সুন্দর দরজা। মেঝেটা পাটাতন করা। কাজ সারার জায়গাটা চারকোনা করে কাটা। দুপাশে পা রেখে বসার জন্য পিড়ির মতো উঁচু দুখানা কাঠ। পায়খানা ঘরে যাওয়ার জন্য স্টিমারে চড়ার সিঁড়ির মতো লম্বা সিঁড়ি।

আমি সেদিকটায় গেছি, হঠাৎ দেখি পিতলের বদনা হাতে পায়খানা ঘর থেকে বেরুচ্ছেন গনি মামা। তার মানে পায়খানায় বসে কাজ সারতে সারতে গান গাইছিলেন তিনি।

আমাকে দেখে বললেন, কী রে বিলাই, তুই এহেনে কী করচ?

আমার বিলাই নামটা দিয়েছিলেন হামিদ মামা। আমি ছিলাম বিড়ালের মতন নরম, আদুরে। এজন্য ওই নাম। বিলাই নামটা আজিজ পছন্দ করেনি বলে সে নাম দিয়েছিল মিলুকর্তা।

মনে আছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শব্দটা প্রথম শুনেছিলাম গনি মামার কাছে। খুলনা থেকে তখন তিনি ঢাকায় চলে এসেছেন। দিনে চাকরি করেন, নাইটে জগন্নাথে বি কম পড়েন। একবার দেশে গেছেন, গিয়ে গান শোনালেন, 'মায়াবনবিহারিণী হরিণী'। অদ্ভুত ধরনের গান। কয়েকটা লাইন আমি শিখে ফেললাম। মামা বললেন, এইটা হইল রবীন্দ্রনাথের গান। রবীন্দ্রসঙ্গীত।

রবীন্দ্রনাথের নাম জানি। 'আমাদের ছোটনদী চলে বাঁকে বাঁকে পড়েছি'। তিনি যে গানেরও লোক জানা ছিল না।

ওই গান কয়েক লাইন লিখে পুরান বাড়ির বিয়ের অনুষ্ঠানে সন্ধ্যার পর মাইকে গাইলাম। গনি মামা তখন বাড়িতে। গানটা তিনি শুনলেন। পরদিন সকালে আমার সঙ্গে দেখা। কান মুচড়ে ধরলেন। তরে ওই গান কে গাইতে কইছে? সুর তো পল্লীগীতির মতন হইয়া গেছে।

যা লজ্জা পেলাম!

মাইকের সঙ্গে তখন নতুন প্রচলন হয়েছে মাউথ স্পিকারের। মাউথটা কেউ বলতো না, বলতো স্পিকার। মাইক ভাড়া আনলে স্পিকারও আনতে হবে। গ্রামের যারা একটু গান টান করে তারা দুহাতে স্পিকার ধরে, মনের পুরো মাধুরি ঢেলে গান করবে। স্পিকারটা ভোমা সাইজের। বেশ ভারি। আমি ধরে রাখতে পারতাম না। গান গাইবার সময় বড়রা কেউ সামনে ধরে রাখতো।

এই গান গাওয়াকে লোকে বলতো 'গান দেওয়া'। কী রে মিলু, হালদার বাড়ির মাইকে কাইল রাইত্রে তুই গান দিছস?

মেদিনী মণ্ডল গ্রামে সবচাইতে ভাল গান গাইতো খান বাড়ির নোনা। খান বাড়িকে লোকে বলে 'খাইগ বাড়ি'। খাইগ বাড়ির নোনার পরই ছিল আমার স্থান। কখনও কখনও দুজনে খুব কমপিটিশান হতো। কাজির পাগলা স্কুলে একবারের স্পোর্টসে নোনা গান গাইল, আমিও গাইলাম। নোনা আমার বড়। তাকে ডাকতাম নোনাদা। তার গলাটা গানের মাঝখানে ক্র্যাক করে গেল। সেবার আমি গেলাম ফার্স্ট হয়ে। গানের কথাটা এখনও মনে আছে। তালাত মাহমুদের বাংলা গান। 'এই তো বেশ এই নদীর তীরে বসে গান শোনাই'।

এই গানটার মিউজিকে নদীজলের একটা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছিল। বড় অদ্ভুত লাগতো শুনতে।

আজাদের বন্ধু ছিল শফি। বাড়ি পুব কুমারভোগ। চন্দ্রেরবাড়ির কাছে। চন্দ্রেরবাড়ির সঙ্গে বিশাল মাঠ। সেই মাঠে স্পোর্টস। স্পোর্টস হতো মাঘ ফাল্গুন মাসে। না শীত না গরম ওই রকম ওয়েদার। হামিদমামা রউফ মামাদেরও বেশ কজন বন্ধুবান্ধব ওই গ্রামে। দল বেঁধে স্পোর্টসে যাচ্ছে ওরা। হামিদমামা বলল, ওই বিলাই, তুইও ল।

আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটলাম।

তখন স্পঞ্জের স্যান্ডেল আর ক্যারোলিনের শার্ট খুবই মূল্যবান জিনিস। গত ঈদে আমাদের দুইভাইকে ক্যারোলিনের শার্ট কিনে দিয়েছেন আব্বা, স্পঞ্জের স্যান্ডেল কিনে দিয়েছেন। হাফহাতা আকাশি রংয়ের ক্যারোলিনের শার্ট আর ঘিয়া রংয়ের ইংলিশ প্যান্ট, পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল, চন্দ্রের বাড়ির মাঠে গেলাম স্পোর্টস দেখতে। আমি নাদুস নুদুস, নরম নিরীহ টাইপ। খেলাধুলা একদমই পারি না। কোনও খেলাতেই নাম লেখাইনি। কে যেন বলল, ওই ছেমড়া, তুই অংক দৌড়টা দে।

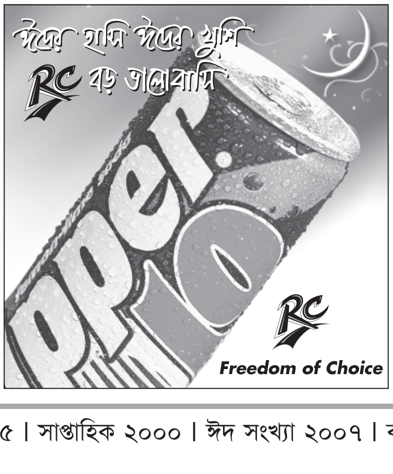

'অংকদৌড়' নামে একটা খেলা ছিল। শ খানেক গজ দূরে কাগজে একটা অংক দেয়া থাকবে। যোগ বিয়োগ কিংবা গুণ ভাগ। আর একটা পেন্সিল থাকবে। দৌড়ে গিয়ে অংকের ফলটা লিখে, নিজের নাম লিখে যে দৌড়ে এসে কাগজটা আগে জমা দেবে সে ফার্স্ট হবে। পর্যায়ক্রমে সেকেন্ড থার্ড।

জীবনে একবার এই দৌড়টা আমি দিয়েছিলাম। পুরানবাড়ির মাঠে স্পোর্টস হচ্ছিল। দৌড়ে অংক করতে গিয়ে দেখি অদ্ভুত একটা অংক। ১০০০০০ থেকে ৯৯৯৯৯ বাদ দিতে হবে। একটু ধাঁধা টাইপের বিয়োগ অংক। অংকটা আমি জানতাম। রেজাল্ট হবে ১। মুহূর্তে লিখে ফিরে এলাম।

ফার্স্ট।

কিন্তু ফার্স্ট হয়েও ফার্স্টটা আমি হলাম না। নাম লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম।

এই দুঃখটা বহুদিন মনের মধ্যে ছিল। সেই কারণে স্পোর্টসে অংশগ্রহণ করা আর কখনও হয়নি। চন্দ্রেরবাড়ির মাঠে ওই কথা শুনে আরেকজন কে বলল, ও দোড়াদৌড়ি পারে না। মাইকে গান দেয়।

তয় একখান গান দে বাজান।

আমার মুখের সামনে স্পিকার ধরল। আমি গান দিলাম। 'আগে জানি নারে দয়াল তোর পিরিতে এ পরান যাবে।' গান শুনে স্পোর্টসে আসা সব লোকের তাক লেগে গেল। তারপর দেখি একটা করে খেলা শেষ হয় আর আমাকে একটা করে গান দিতে বলে। যত গান জানতাম সব সেদিন গেয়ে ফেললাম। বিকালের দিকে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন শুরু হলো। সব বিভাগে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডদের প্রাইজ দেয়া হলো। আমার তো প্রাইজ পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ গান কোনও স্পোর্টসের মধ্যে পড়ে না। আমার কোনও কম্পিটিটারও ছিল না।

আশ্চর্য ব্যাপার, সব শেষে আমার নাম ঘোষণা করা হলো। গান দেয়ার জন্য আমাকে একটা বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়েছে। মনে আছে, আঙুল সাইজের বারোটা রং পেন্সিল ছিল প্রাইজ। সুন্দর একটা প্লাস্টিকের বাক্সে ছিল পেন্সিলগুলো।

ওই ছিল আমার জীবনে প্রথম প্রাইজ।

কালিরখিলের স্পোর্টসেও গান দিয়েছিলাম। গান তেমন সুবিধার হয়নি। আগের সন্ধ্যায় কুচি কুচি করে আদা কেটে দিয়েছিল বুজি না পুনুআম্মা মনে নেই। পুনু হচ্ছে আমার ছোটখালা। আমরা তাকে ডাকি আম্মা। নানার ছিল দুই বিয়ে। আগের ঘরের একটি মেয়ে আছে, সেরুদার মা। পরের ঘরে মা আর পুনুআম্মা। একটা ভাইও হয়েছিল, টগর। সাতআট বছর বয়সে মারা যায়। বাগানে নানার সঙ্গে তারও কবর।

তো আগের সন্ধ্যায় আদা খেয়ে চেঁচিয়ে